● শ্রাবণ গাথা ১৩৪১

'শেষবর্ষণ' ও 'শ্রাবণগাথা'— আঙ্গিকের দিক দিয়ে একই রকম। উভয় এই নাট্য সুলভ কুশীলবেরা (রাজা, কবি প্রভৃতি) গদ্য সংলাপে ভাষ্য বা গানগুলির বক্তব্য ব্যাখ্যা করছেন।

১৩৪১ এর বর্ষাকালে কোনো নতুন গান মনে না আসায় কবি পুরনো গানের সঙ্গে ভাষ্য ও সংলাপ যুক্ত করে 'শ্রাবণগাথা উপস্থাপিত করেন। প্রভাত কুমারের মতে— "গানের সম্ভোগ তাহার রসাস্বাদনে— এই তত্ত্বের সমর্থন"-ই এর নাটকীয় সংলাপের উদ্দেশ্য। যাইহোক, রসসম্ভোগ বিষয়ক কয়েকটি সংলাপ শ্রাবণ গাথার মূল্যবান সম্পদ। যেমন— 'রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ একদিকে, একটি মাত্র ফুল এক দিকে— তাতেও ওজন থাকে। অসীম অন্ধকার একদিকে, একটি তারা একদিকে— তাতেও ওজনের ভুল হয় না। বিরহের সরোবর হোক না অকূল। তারই মধ্যে একটিমাত্র মিলনের পথই যথেষ্ট।" অথবা, "রস যোগান দিলেই যে রস ভোগ করা যায় তা নয়, নিজের অন্তরে রসরাজের দয়া থাকা চাই।"

গান আমার যায়

● নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা — ১৩৩৩

'নটীর পূজা' অভিনয়ের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন, এবং 'নজীর পূজা'র, পর থেকেই নটরাজের প্রতিও রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ বাড়ে। নটীর নৃত্যবেগ কবির মনকে এক গম্ভীর ভাবের গভীরতায় নিয়ে গেল। এর ফলে সৃষ্টি হল নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা। এ ঋতুনাট্যের মর্মকথা কী? নাট্যের ভূমিকাতেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়। তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। নটরাজ পালাগানের এই মর্ম।" পূর্ববর্তী কবিতা ও গানে বরাবর লক্ষ্য করেছি বহির্জগত আর অন্তর্জগত এই দুই-কে নিয়েই তাঁর ধ্যানের বিশ্ব। ভাব ও রূপ— এক অপরের পরিপূরক। দুই-এ মিলে পূর্ণতা। বহির্বিশ্বে প্রতীয়মান জগত আর অন্তর্লোকে যার প্রতিফলন— দুই নিয়েই জগতের আস্বাদন।

রুদ্র মহাদেবের ধ্যান রবীন্দ্রনাথের নানা প্রবন্ধে ও গানে আছে। এই রুদ্রকে নটরাজ রূপে তিনি এবার দেখছেন। জন্ম-মৃত্যুর জীবনচক্রের মধ্যবর্তী, সৃষ্টি ও ধ্বংসের কেন্দ্রবর্তী এ দেবতাকে তিনি পূর্ণরূপেই দেখতে চান। এই পূর্ণ দেবতার সমগ্রকে কবি তাঁর সমগ্র ইন্দ্রিয় দেহ, মন, আত্মা দিয়ে অনুভব করতে চান। সেই তো মুক্তি। মুক্তিতত্ত্বের জন্য তিনি 'তত্ত্বশিরোমণি'র কাছে যেতে চান না। মহাকালের বিপুল নাচে 'বাঁধন খোলার' সাধন কবি শিখতে চান। 'প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে নূতন প্রাণের যাত্রাপথে'— এই জীবনমৃত্যুচক্রের নিত্য আবর্তন পথেই তো বিশ্বলীলা।— এটাই মুক্তি। এই লীলার যোগ দিলে তবেই মুক্তি পাওয়া যায়।

প্রকৃতিতে ঋতুর পরে ঋতু আসে। প্রত্যেকটি ঋতুই আবির্ভাব ও তিরোভাব দিয়ে ঘেরা। এই সব ঋতুর অন্তর্নিহিত যিনি মহাকাল তিনি সূত্রের মতোই ঋতুগুলোকে ধরে রেখেছেন। কেউই বিচ্ছিন্ন নয়। এই অন্তর্নিহিত মহাকালই। বিচিত্রের মধ্যবর্তী

একের মতোই, নানা ঋতুতে নানা রূপে আবির্ভূত হন। জন্মেও তিনি মৃত্যুতেও তিনি। এই জন্ম ও মৃত্যুকে নিয়েই যে জীবনধারা সেখানে অবগাহন করতে পারলেই মুক্তি পাওয়া যায়। 'প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে নূতন প্রাণের যাত্রাপথে'— এ পথেই কবি মুক্তির আনন্দ পেতে চাইছেন।

'নটরাজ, আমি তব
কবি শিষ্য, ...।
তোমার তাণ্ডবতালে কর্মের বন্ধন গ্রন্থিগুলি
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি।'

কবি নটরাজের নাটের অঙ্গনে মুক্তি মন্ত্রে দীক্ষা নিতে চান।

'তোমার বিশ্বনাচের দোলায় দোলায়
বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়,—
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে....।'

ঋতুলীলার নাচের মধ্যে কবি নটরাজের এই লীলারস উপলব্ধি করতে চান। ঋতুচক্রের মধ্যে তাঁর এক পদক্ষেপ, অন্য পদক্ষেপ মানবের অন্তর্লোকে। দুই ক্ষেত্রের এই পদক্ষেপের সামঞ্জস্য বিধানেই মুক্তি।

'ধ্যাননিমগ্ন নীরব নগ্ন নিশ্চল তব চিত্ত;
নিঃস্ব গগনে বিশ্ব ভুবনে নিঃশেষ সব বিত্ত।
রসহীন তরু নির্জীব মরু,
পবনে গর্জে রুদ্র ডমরু,
ওই চারিধার করে হাহাকার ধরা ভাণ্ডার রিক্ত।'

এই হল বৈশাখের তপস্যামগ্ন রূপ। কবি চাইছেন—

'জাগো ফুলে ফলে নবতৃণ দলে
তাপস লোচন মেলো হে।
জাগো মানবের আশায় ভাষায়
নাচের চরণ ফেলো হে।'

বৈশাখকে আবাহন করেন নবজীবনের প্রার্থনা দিয়ে—

'এস এস এস হে বৈশাখ।
তাপসনিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।।'

পৃথিবীর মুমূর্ষু-তাকে 'চরম সর্বনাশে' ডুবিয়ে দিয়ে এলো 'সাধনধন'— বৈশাখী ঝড় রূপে।—

'জাগরে হতাশ আয় রে ছুটে
অবসাদের বাঁধন টুটে।'

উমার তপস্যা ও মহেশ্বরের ধ্যানভঙ্গের চিত্র 'তপোভঙ্গ' কবিতাটির মতো এখানেও আছে। মহাদেবের ধ্যানে রয়েছে মাধুরীর, স্বপ্ন—

'শান্ত প্রান্তরের কোণে
রুদ্রবসি তাই শোনে।

মধুরের ধ্যানাবেশে স্বপ্নমগ্ন আঁখি;
হে রাখাল, বেণু যবে বাজাও একাকী।'

পঞ্চশরের মতন কবি-রাখাল বেণু বাজান। আর উমার ধ্যানে মহেশ 'মাধুরী সাধনা'-তে মগ্ন হন।

এই মাধুরীর রূপ আসে বর্ষার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে। 'তপের তাপের বাঁধন' ফেটে আষাঢ় আসে 'রসের বর্ষনে'। উমার তপস্যার দুর্দিন

'দুঃখ ঘুচিয়ে নিঃশেষে
মনোমাঝে যারে রুদ্ধনয়নে
পূজিলে ধ্যানের পুষ্প চয়নে
দেখা দিবে আজি বিশ্বে সে।'

মহেশের তপস্যার 'শ্বেত উত্তরী' আজ কালো রঙে বিভূষিত— বর্ষার মেঘরঙে।

'লুকায়ে ছায়ার মেঘের মায়ার কী বৈভব।'

আসে বর্ষা, আসে শ্রাবণ। তপস্যামগ্ন নীরব সন্ন্যাসীর

'কী গান ঘনালো মনে...
বাদল আঁধার মাতাল তোমার হিয়া
বাঁকা বিদ্যুত চোখে উঠে চমকিয়া।'
'চিরজনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া
আজি এ বিরহ-দীপক-দীপিকা
পাঠাল তোমারে এ কোন্ লিপিকা,
লিখিল নিখিল-আঁখির কাজল দিয়া
চির জনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া।'

শ্রাবণ চলে যায়— কার আগমনের সংবাদে—

'শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে;
পথে তারি সকল বারি দিলে ঢেলে।'

শ্রাবণ যায়, তবে নিঃশেষে নয়, শরতের মধ্যে রেখে যায় তার রেশ।

'শরৎ বলে গেঁথে দেব কালোয় আলো।
সাজবে বাদল আকাশমাঝে সোনার সাজে
কালিমা ওর মুছে ফেলে।'

শ্রাবণ চলে যায়। উমা-মহেশের মিলনে দেবসেনাপতি কুমার কার্তিকেয়-র আবির্ভাব। শরৎ যেন সেই কুমার। কালিদাসের 'মেঘদূতের' মতো 'কুমার সম্ভব'ও কবির রচনায় বার বার ঘুরে ফিরে আসে। এখানে শরতের রূপ যেন কুমারের মতো। 'আঁধারের সাথে আলোকের মহাসমরে' দেবসেনাপতি কার্তিকেয়'-র মতোই শরতের আবির্ভাব। পৌরাণিক উপকথা যেন শরতের আগমনে নতুনভাবে শোনা যাচ্ছে।

'শরৎ এনেছে অপরূপ রূপকথা
নিত্যকালের বালক বীরের মানসে।'

শরৎ তরুণ, সে পথিক। সে নিয়ে আসে 'কাজ ভোলাবার বাঁশি'।

"শরৎ ডাকে ঘরছাড়ানো ডাকা

কাজখোয়ানো সুরে।...."

"সেইতো তোমার পথের বঁধু, সেই তো
দূর কুসুমের গন্ধ এনে খোঁজায় মধু।"

তার সাথে আসে 'আলো অমল কমলের' গন্ধ,— আর

"...মনের ভাবনাগুলি
বাহির হোলো পাখা তুলি,
ওই কমলের পথে...।"

শরৎ চলে যায়। কবি নটরাজকে আক্ষেপের সঙ্গে বলেন—

"তোমার যে আলোকে
অমৃত দিত চোখে
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি?"

হেমন্তের প্রবেশে প্রথমেই কবি বলেছেন—

'তুমি ক্ষুধার্ত-জন অরণ্য
অমৃত-অন্ন-ভোগ ধন্য
করো অন্তর মম।'

বাংলায় হেমন্ত পাকাধানের ঋতু। ঘরে ফসল তোলার সময়। হেমন্ত তাই লক্ষ্মী। তবু হেমন্ত বড়ো সংক্ষিপ্ত। যদিও

'ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে।'

তবু হেমন্ত যেন আড়ালেই থেকে যায়—

'আপন দানের আড়ালেতে
রইলে কেন আসন পেতে—
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন করে রাখা?'

স্বর্গলোকে ম্লান করে ধরার বৈভব বাড়ানো হেমন্ত-র প্রধান কাজ। তবে হেমন্তের আরো একটি ভূমিকা কবির চোখে ধরা পড়েছে। হেমন্তিকা হিমের রাতে গগনের দীপগুলিকে কুয়াশার অন্তরালে পাঠিয়ে দিয়ে ধরার ছেলে মেয়েদের আপন আলোর দীপালি জ্বালাবার আহ্বান জানাচ্ছে—

'এল আঁধার দিন ফুরালো
দীপালিকায় জ্বালাও আলো
জ্বালাও আলো আপন আলো।
জয় করো এই তামসীরে।'

এর পরে আসে শীত। নটরাজের এও এক রূপান্তর। শীতের বেশ সন্ন্যাসীর বেশ। সে হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এসেছে। 'জীর্ণতার মোহবন্ধ ছিন্ন করে'

'সাজাবে কি ডালা গাঁথিবে কি মালা
মরণ সত্রে'

'নির্দয় অতি করুণা তোমার
বন্ধু তুমি হে নির্মম—
যা কিছু জীর্ণ করিবে দীর্ণ

দণ্ড তোমার দুর্দম।'

কবি মিনতি করেছেন— 'হও প্রসন্ন'।

ধরনী যে তব তাণ্ডবে সাথি
প্রলয় বেদনা নিল বুকে পাতি,
রুদ্র এবারে বরবেশে তারে করগো ধন্য—
হও প্রসন্ন।'

এবার নটরাজ তাঁর কাপড়টি পাল্টে পরবেন। 'বসন্ত'-র "ঋতুরাজের গায়ের যে কাপড়খানা আছে, তার এক পিঠে নূতন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উল্টে পরেন— তখন দেখি শুকনো পাতা ঝরা ফুল; আবার যখন পাল্টে যেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলা মালতী, তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরী, চৈত্রের কণকচাঁপা।"
"উৎসবপতি মহানন্দ" সুন্দরতম বসন্ত এবারে আসবে।

'ছিন্ন পথ চেয়ে বহু দুখ সয়ে,
আজ দেখি একী দৃশ্য,
শক্তি যেথায় সুন্দর হয়ে
জিনিল কঠিন বিশ্ব।....
যা ছিল শ্রীহীন দীপ্তিবিহীন
করিল প্রজ্বলন্ত।

শুকনো পাতায় ছেয়ে যাওয়া কাননবীথি। এর মধ্যে বসন্তের আসন কোথায় হবে? বসন্ত এসে সব পূর্ণ করে দিক।

'সুর ভরা ওই ধরার বাঁশি লুটায় ভুঁয়ে
মর্মে তাহার তোমার হাসি দাও না ছুঁয়ে।
মাতবে আকাশ নবীন রঙের তানে তানে....
হে অতিথি।'

বসন্ত আসে বনে বনে রঙ লাগিয়ে, সমীরণে ঢেউ জাগিয়ে; সমস্ত আকাশে বাতাসে আনন্দের দোল জাগিয়ে। বসন্তকে কবি বলেছেন—

'হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান ভরা ধন,
বৎসরের শেষে
শুধু একবার মর্ত্যে মূর্তি ধর ভুবন মোহন
নব বরবেশে....।'
'হে বসন্ত হে সুন্দর, হায় হায়, তোমার করুণা
ক্ষণকালে তরে।'—

বসন্তের এই ক্ষণস্থিতি—

এর তাৎপর্য আছে। বসন্ত চির পলাতক।

'তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্তিকাশৃঙ্খলে
শক্তি আছে কার?
ইচ্ছায় বন্ধন লও, সে বন্ধন ইন্দ্রজাল বলে
কর অলংকার।'

হোক না ক্ষণকাল। মাঝে মাঝে এই ধরা যদি ওই ক্ষণকালের জন্যেও বসন্তের স্পর্শ পায়, তবু সে ধন্য হবে।

'নন্দনে আনন্দ তুমি, এই মর্ত্যে, হে মর্ত্যের প্রিয়
নিত্য নাই হলে।
সুদূর মাধুর্যপানে তব স্পর্শ, অনির্বচনীয়,
দ্বার যদি খোলে,
ক্ষণে ক্ষণে সেথা আসি নিস্তব্ধ দাঁড়াবে বসুন্ধরা,
লাগিবে মন্দার রেণু শিরে তার ঊর্ধ্ব হতে ঝরা,
মাটির বিচ্ছেদ পাত্রে স্বর্গের উচ্ছ্বাস রসে ভরা
রবে তার কোলে।'

বিদায়কালে কবি নটরাজকে বলছেন—

'জানি জানি তুমি আসিবে আবার, জানি,...
বনপথে যবে যাবে সে-ক্ষণের
হয়তো বা কিছু রবে স্মরণের,
তুলি লব সেই তব চরণের দলিত কুসুম খানি।'

যাবার আগে বসন্ত পৃথিবীকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়। দুলিয়ে দিয়ে যায়। 'এসেছে হাওয়া বাণীতে দোলদোলানো'। এই দোল সর্বব্রব্যাপী— প্রকৃতি ও মানুষ, বাহির ও অন্তর, সর্বত্র নটরাজের দুই পদক্ষেপের আঘাতের দোলা।—

'লাগিল দোল জলে স্থলে।
লাগিল দোল বনে,
সোহাগিণীর হৃদয়তলে
বিরহিণীর মনে।'

'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' পূর্ববর্তী দুটি ঋতুনাট্য থেকে একটু পৃথক। এতে রাজা, নাট্যাচার্য, সভাকবি, পরিষদ প্রভৃতি চরিত্র নেই। নাট্যসুলভ সংলাপ নেই। এখানে গদ্যভাষ্য নেই। আছে কেবল কবিতা ও গান। কবিতা ও গান পরস্পরের পরিপূরক। কবিতাগুলি আবৃত্তির জন্যে। কবিতাগুলি ভাবসূত্র— গানগুলি তাতে ফুল। এই মালার সূত্রেই ছয়ঋতু ও ঋতুর অন্তরালবর্তী নটরাজ— সবই একটি অখণ্ড কালচক্রের রূপ নিয়েছে। এবং অন্তিমতঃ নটরাজের লীলাই এই ঋতু নাট্যের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কালচক্রের মধ্য দিয়েই তিনি বিবর্তিত হতে হতে চলেছেন— রূপ থেকে রূপান্তরে।

'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' রচনা একটি স্মরণীয় ঘটনা। প্রভাত কুমার (রবীন্দ্রজীবনী—৩) বলেছেন "..... কবির এক শ্রেণীর গান বিশেষভাবে নৃত্যাশ্রয়ী হয়; আর নৃত্যও হয় সঙ্গীত-অপেক্ষী। সেই দিক হইতে নটরাজ রচনা (১৩৩৩, ফাল্গুন) বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইবে।"

নটরাজ.... এর গান

নৃত্যের তালে তালে	খাম্বাজ
এস হে বৈশাখ	ইমন, ভূপালি
নমো নমো হে বৈরাগী	ইমন
হৃদয় আমার	কীর্তন
মধ্যদিনে যাবে গান	হাম্বীর
নমো নমো নমো করুণাঘন	গৌড়মল্লার, কেদারা
তপের তাপের বাঁধন	দেশ
এ' কি এলে আকাশ পারে	সাহানা
গগনে গগনে আপনার	সাহানা

শ্রাবণ তুমি বাতাসে	বিভাস
কেন পান্থ এ চঞ্চলতা	কাফি, খাম্বাজ
পাগল আজি আগল	কাফি, পিলু
নির্মল কাণ্ড নমো হে	ভৈরবী
আলোর অমল কমলখানি	ভৈরব, ভৈরবী
সেই তো তোমার পথের	রামকেলি, ভৈরবী
শিউলি ফুল, শিউলি ফুল	পিলু, বারোয়াঁ
চরণ রেখা তব	ভৈরবী
নম নম নম। তুমি	কাফি
শিউলি ফোটা	কাফি, সাহানা
হায় হেমন্তলক্ষ্মী	কীর্তন
হিমের রাতে ওই	বেহাগ, খাম্বাজ
শীতের বনে কোন্	বেহাগ, খাম্বাজ
শীতের হাওয়ার লাগল	কীর্তন
নম নম নম নম। নির্দয়	কীর্তন
হে সন্ন্যাসী	সুলতান, ভীমপলশ্রী
নম নম নম তুমি সুন্দরতম	সোহিণী
তোমার আসন পাতল	আড়াণা
রঙ লাগালে বনে	খাম্বাজ
মুখখানি কর	আলাহিয়া, বেহাগ
জানি তুমি ফিরে	পীলু, বারোয়াঁ
মনে রবে কি না রবে	খাম্বাজ
ওরে প্রজাপতি	ভৈরব, ভৈরবী
সন্ন্যাসী যে জাগিল	ইমন, কানাড়া
রাঙিয়ে দিয়ে যাও	বাউল
ওগো কিশোর আজি	খাম্বাজ, সিন্ধু, বাহার, পিলু, বারোয়াঁ